দৈনিক খবর

তারিখ ... 25 AUG 1988 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রসঙ্গ ঃ প্রাইমারী ছাত্রদের স্কুল ত্যাগ

দেশের সামগ্রিক পশ্চাৎপদতা ও দারিদ্র্য কাটিয়ে ওঠার জন্যে শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে- এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণের কোন অবকাশ নেই। দেশের শতকরা ৭৮ জন মানুষ এখনও অশিক্ষিত। এদের শিক্ষিত না করে তুলতে পারলে রাষ্ট্রীয় কল্যাণের আশা করাটা বাতুলতা মাত্র। দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত করাই আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর এজন্যে শিক্ষার হার এবং মান উভয়ই বাড়ানোর ব্যাপারে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমরা না বাড়াতে পারছি শিক্ষার হার, না মান। এখনও প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তাছাড়া সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোতে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকলেও বেসরকারী পর্যায়ের প্রাথমিক স্কুলগুলোতে সেই সুযোগ নেই। প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা কম থাকায় ব্যাঙের ছাতার মত কিণ্ডার গার্টেন স্কুল চালু হচ্ছে একটার পর একটা। বলাবাহুল্য, কিণ্ডার গার্টেনে লেখাপড়া অত্যন্ত ব্যয় বহুল। আমাদের দেশের মানুষ এমনিতেই গরীব। অর্থাভাবে তারা যেখানে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানই ঠিকমত করতে পারে না, সেখানে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে অভিভাবকরা অর্থ ব্যয় করবে কোথেকে। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করা না গেলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে আমরা কিছুই করে যেতে পারবো না।

প্রতি বছর স্কুলে পড়ার উপযোগী শিশুদের সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু তাদের সবাইকে কি আমরা স্কুলে পাঠাতে পারছি? মোটেই না। খোঁজ করলে দেখা যাবে, দেশের বিপুলসংখ্যক শিশু যারা স্কুলে পড়ার মত বয়সে পৌঁছতে তারা নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে স্কুলের গন্ডি পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না। আবার অনেক শিশু স্কুলে ভর্তি হয়ে দু'এক বছরের মধ্যেই ইতি টানছে লেখাপড়ার। কোন রকমে টেনেটুনে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত আনা গেলেও শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে যাওয়ার সুযোগ অনেকেরই হয় না। এ প্রসঙ্গে দিনাজপুর জেলার কিছু তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক খবরে জানা যায়, আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্ন কারণে দিনাজপুর জেলার ৯৫ হাজার ৩শ' ২২টি শিশু প্রাথমিক পর্যায়ের পর শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারী পরিসংখ্যানের বরাদ দিয়ে খবরে জানানো হয়েছে, ১৯৮৮ সালের হিসেব অনুযায়ী জেলায় ৩ লাখ ৪৮ হাজার ২শ' ১৪টি শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৩ লাখ ৩২ হাজার ১শ' ১৭, তৃতীয় শ্রেণীতে ৩ লাখ ২৫ হাজার ৫শ' ৬০, চতুর্থ শ্রেণীতে ৩ লাখ ১২ হাজার ৭শ' ৭২ এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ২ লাখ ৫২ হাজার ৮শ' ৯২। এ তথ্য অনুযায়ী ১৬ হাজার ৯৭টি শিশু প্রথম শ্রেণীর পর আর লেখাপড়ার সুযোগ পায় না। এভাবে দ্বিতীয় শ্রেণী হতে তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সময় ৬ হাজার ৫শ' ৫৭ জন, তৃতীয় হতে চতুর্থ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সময় ১২ হাজার ৭শ' ৯৮ জন এবং চতুর্থ শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার সময় আরো ৫৯ হাজার ৮শ' ৮০ জন শিশুর শিক্ষা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। অতঃপর প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষার মাধ্যমিক পর্যায়ে এসে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যে আরো হ্রাস পায় তা অনুমান করেই বলা যায়।

দিনাজপুর জেলার এ তথ্য থেকে আমরা অপরাপর জেলার স্কুলছুট ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা আঁচ করতে পারি। অর্থাৎ অন্যান্য জেলার তথ্যও যে কম-বেশী একই রকম হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন শিশুরা ভর্তি হয়ে আবার স্কুল ছেড়ে দেয়। এ সম্পর্কে উক্ত খবরে ইঙ্গিতও দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আর্থিক অসচ্ছলতাসহ বিভিন্ন কারণ। আসলে বাস্তবে ঘটেও তাই। পল্লী এলাকার মানুষ সাধারণভাবে দরিদ্র। এরা অত্যন্ত টানাপোড়নের মধ্যে জীবনযাপন করে। ছেলে-মেয়ের সংখ্যা বেশী বলে আর্থিক অনটন স্বাভাবিক কারণেই এদের বেশী। এক সাথে অধিকসংখ্যক ছেলে-মেয়ের ভরণ-পোষণই যেখানে দুঃসাধ্য ব্যাপার, সেখানে লেখাপড়ার খরচ চালানো যে কতটা অসুবিধাজনক তা একমাত্র ভুক্তভোগীর পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব। এ কারণে অনেক অভিভাবকের ইচ্ছে থাকলেও নিছক অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে তারা ছেলে-মেয়েদের স্কুলে দিতে চান না বা দিলেও এক সময় ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। তারা মনে করেন, লেখাপড়ায় সময় নষ্ট না করে কৃষিকাজে ছেলেরা যদি তাদের সহায়তা করে তাহলে অনেক উপকার হয়। এটা ভেবে তারা ছেলেদের স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেন। অবশ্য আর্থিক কারণেই যে কেবল এমনটা ঘটছে তা নয়। শিক্ষার প্রতি অনীহাও একটা প্রধান কারণ। এমন অনেক কৃষকও আছেন যারা লেখাপড়া শেখার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন বোধ করেন না। তারা মনে করেন কৃষিকাজ জানলেই হলো, লেখাপড়ার এমনকি দরকার। সেজন্যে তারা শৈশব থেকেই সন্তানদের কৃষিকাজ শেখানোর দায়িত্ব নেন বিদ্যার্জনের পথ রুদ্ধ করে। এছাড়া রয়েছে পরিবেশগত কারণ। শহরের একজন অভিভাবক ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পড়তে দেন, কারণ তিনি শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে কিছুটা হলেও সচেতন। তিনি দেখেন তার চারপাশের সবাই ছেলে-মেয়েদের পড়ার ব্যাপারে আগ্রহী। তাই নিজেকে তিনি বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না ঐ সামাজিক পরিবেশ থেকে। আপন তাগিদেই ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন তারা। শিশুরাও এমন পরিবেশে লেখাপড়া করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু গ্রামের অভিভাবক এ ব্যাপারে ততটা সচেতন নন। লেখাপড়ার চাইতে কৃষিকাজকেই তারা প্রাধান্য দেন। শিক্ষাবিমুখ পরিবেশে শিশুরাও শিক্ষার প্রতি তেমন অনুরক্ত হয় না। ফলে অনেক শিশুই স্কুল পালানোর ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। বই, খাতা, কলম থুয়ে বাবাকে সাহায্য করার জন্যে লাঙ্গল-জোয়াল হাতে নেয়। এভাবেই শিক্ষা জীবনের শুরুতেই ঘটে বিদ্যা চর্চার অবসান।

বস্তুতঃ সমগ্র দেশবাসীকে শিক্ষামুখী না করে তুলতে পারলে এসব অসুবিধা দূর হবার নয়। সরকার শিক্ষার হার ও মান বাড়ানোর জন্যে তৎপর হয়েছেন এ কথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু এজন্যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার তার কতটুকু কি হচ্ছে সে বিষয়টি অস্পষ্ট। আমরা মনে করি প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে জনসাধারণ শিক্ষার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হবে। এজন্যে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। জনগণকে শিক্ষামুখী করে তুলতে পারলে এবং সেই সাথে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে পারলে আমাদের বিশ্বাস, জনসাধারণের তরফ থেকে শিক্ষার ব্যাপারে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া যাবে।